أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/র)

www.motaher21.net

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

ফিতনা হত্যা থেকেও গুরুতর অন্যায়।

Oppression is worse than slaughter.

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২১৭

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ؕ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ؕ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ كُفْرٌۢ بِهٖ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۫ وَ اِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ؕ وَ لَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ؕ وَ مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

লোকেরা তোমাকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে। বলে দাওঃ ঐ মাসে যুদ্ধ করা অত্যন্ত খারাপ কাজ। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখা, আল্লাহর সাথে কুফরী করা, মসজিদে হারামের পথ আল্লাহ – বিশ্বাসীদের জন্য বন্ধ করে দেয়া এবং হারাম শরীফের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বের করে দেয়া আল্লাহর নিকট তার চাইতেও বেশী খারাপ কাজ। আর ফিত্না হত্যাকান্ডের চাইতেও গুরুতর অপরাধ। তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেই যাবে, এমন কি তাদের ক্ষমতায় কুলোলে তারা তোমাদেরকে এই দ্বীন থেকেও ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। (আর একথা খুব ভালোভাবেই জেনে রাখো), তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই এই দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের অবস্থায় মারা যাবে, দুনিয়ায় ও আখেরাতে

উভয় স্থানে তার সমস্ত কর্মকান্ড ব্যর্থ হয়ে যাবে। এই ধরনের সমস্ত লোকই জাহান্নামের বাসিন্দা এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

২১৭ নং আয়াতের তাফসীর:

নাখলায় সেনা অভিযান এবং নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা

ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, জুন্দুব ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং আবূ ‘উবাইদা ইবনু জাররাহ (রাঃ) -কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি বিদায়ের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর বিচ্ছেদের দুঃখে ভীষণ ক্রন্দন করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ফিরিয়ে নেন এবং তার স্থলে ‘আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাঃ) -কে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তাকে একটি পত্র দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ ‘বাতনে নাখলাহ’ নামক স্থানে পৌঁছার পূর্বে এই পত্র পাঠ করবে না। সেখানে পৌঁছে বিষয়বস্তু দেখার পর সাথীদের কাউকে তোমার সাথে যাবার জন্য বাধ্য করবে না। অতএব ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) এই ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়েই যাত্রা শুরু করেন। নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নির্দেশনামা পাঠ করেন “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি‘উন” পড়েন এবং বলেনঃ ‘আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নির্দেশনামা পড়েছি এবং তাঁর নির্দেশ পালনে আমি প্রস্তুত রয়েছি।’ অতঃপর তিনি চিঠিটি তাঁর সাথীদের পাঠ করে শোনান এবং ঘটনাটি বর্ণনা করেন। সুতরাং দুই ব্যক্তি ফিরে যান কিন্তু অন্যরা সবাই তার সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হোন। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তারা ইবনু হাযরামী নামক কাফিরকে দেখতে পান। ঐ দিনটি জমাদিউল আখিরের শেষ দিন ছিলো নাকি রজবের প্রথম দিন এটা তাদের জানা ছিলো না। সুতরাং তারা ঐ দলটির ওপর আক্রমণ চালান এবং ইবনু হাযরামী মারা যায়। মুসলিমদের ঐ দলটি তথা হতে ফিরে আসেন। তখন মুশরিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বলেঃ ‘দেখো! তারা নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করেছে এবং হত্যাও করেছে।’ এ ব্যাপারে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (হাদীসটি সহীহ। তাফসীর ইবনু আবী হাতিম-২/২৬৮, তাফসীর তাবারী -৪/৩০৬/৪০৮৪, আল মাজমা‘উয যাওয়ায়িদ-৬/১৯৮)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জীবনী গ্রন্থের লেখক ‘আবদুল মালিক ইবনু হিশাম (রহঃ) বর্ণনা করেন, যায়দ ইবনু ‘আবদুল্লাহ বাককাই (রহঃ) বলেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক ইবনু ইয়াসার আল মাদানী (রহঃ) তার লেখা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জীবনী গ্রন্থে বলেছেনঃ মুশরিকদের সাথে প্রথম যুদ্ধ বদর প্রান্তর থেকে ফিরে আসার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাঃ) -কে সেনাপতি নিযুক্ত করে অভিযানে প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সাথে আটজন লোক প্রেরণ করেন। তারা সবাই ছিলেন মুহাজির, আনসারগণের মধ্য থেকে কেউ ছিলেন না। তিনি তাকে কিছু লিখিত নির্দেশও দেন এবং আদেশ করেন যে, দুই দিনের পথ অতিক্রম করার পর যেন ঐ লিখিত নির্দেশ ‘আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাঃ) পাঠ করেন এবং তদানুযায়ী সামনের দিকে অগ্রসর হোন। তবে লিখিত আদেশ অনুযায়ী তার সহযাত্রীদের কাউকেও যেন তা মানতে বাধ্য না করা হয়।

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, এই সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিলো সাত জন। আর তারা হলেন 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) , আবূ হুযাইফা ইবনু রাবী 'আ (রাঃ) , সা 'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) , 'উতবাহ ইবনু গাযওয়ান সালামাহ (রাঃ) , সুহাইল ইবনু বায়যা (রাঃ) , আমির ইবনু ফুহাইরা (রাঃ) এবং ওয়াকিদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইয়ারবুঈ (রাঃ) । 'বাতনে নাখলা' পৌছে 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাঃ) পরিস্কারভাবে বলেদিয়েছিলেন যে, যে ব্যক্তি শাহাদাত লাভের প্রত্যাশী একমাত্র সেই সম্মুখে অগ্রসর হবে। এখান হতে প্রত্যাবর্তনকারীগণ ছিলেন সা 'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং আবূ হুযাইফা ইবনু রাবী 'আ (রাঃ) । তারা তাদের সাথে শরীক না থাকার কারণ হলো এই যে, তাদের উট হারিয়ে গিয়েছিলো। সেই উট খোঁজার কারণেই তারা রয়ে গিয়েছিলেন। মুশরিকদের মধ্যে হাকাম ইবনু কাইসান, 'উসমান ইবনু 'আবদুল্লাহ প্রভৃতি ছিলো। ওয়াকিদ (রাঃ) -এর হাতে 'আমর নিহত হয় এবং এই ক্ষুদ্র বাহিনী গণীমত নিয়ে ফিরে আসে। এটাই ছিলো মুসলিমদের প্রথম গণীমত। যখন তারা দু' জন বন্দিসহ গণীমত নিয়ে ফিরে আসে তখন মাক্কার মুশরিকরা প্রতিবাদ স্বরূপ বললোঃ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর দাবীতো এই যে, তিনি মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য স্বীকারকারী, অথচ তিনি সম্মানিত মাসগুলোর সম্মান রক্ষা করছেন না। বরং এগুলোর সম্মান নষ্ট করে রজব মাসেও তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছেন। মুসলমানগণ বললেন আমরা রজব মাসে তো হত্যা করি নি। বরং যুদ্ধই তো হয়েছে জুমাদিল উখরা মাসে। (তাফসীর তাবারী -৪/৩০৫, ৩০৬/৪০৮৩)

অপর একটি বর্ণনায় এসেছে 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাঃ) -এর সাথে মাক্কার মুহাজিরদের যারা ছিলেন তারা হলেন 'আবদ শামস ইবনু 'আবদ মানাফ গোত্রের হুযাইফা ইবনু 'উতবাহ ইবনু রাবি 'আহ ইবনু 'আবদ 'আবদ শামস ইবনু 'আবদ মানাফ (রাঃ) , তাদের মিত্র গোত্রের 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাঃ) যিনি এই অভিযানের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এবং আসাদ ইবনু খুযায়মাহ্‌ গোত্রের উক্কাসাহ ইবনু মিহসান (রাঃ) । নাওফাল ইবনু 'আবদ মানাফ গোত্রের 'উতবাহ গাজওয়ান ইবনু জাবির (রাঃ) , জুহরা ইবনু কিলাব গোত্রের সা 'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) , কা 'ব গোত্র এবং তাদের মিত্র থেকে 'আদী ইবনু 'আমর ইবনু রাবী 'আ (রাঃ) , তামীম গোত্রের ওয়াকিব ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদ মানাফ (রাঃ) , ইবনু আরীন ইবনু সালামাহ ইবনু ইয়ারবু (রাঃ) , সা 'দ ইবনু লাইস গোত্রের খালিদ ইবনু বুকাইর (রাঃ) , আল হারিস ইবনু ফিহর গোত্রের সুহাইল ইবনু বাইদা (রাঃ) -ও তাদের সাথে ছিলেন। অভিযানে দু' দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাঃ) নির্দেশিত চিঠিটি পাঠ করেন। তাতে লিখা ছিলোঃ এ চিঠি পাঠ করার পর তোমরা আরো অগ্রসর হবে এবং মাক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান 'নাখলাহ' নামক স্থানে তোমাদের ঘাঁটি স্থাপন করবে। ওখানে অবস্থান করে কুরাইশদের কাফিলার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখবে এবং তা আমাদেরকে অবহিত করবে। 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাঃ) চিঠিটি পাঠ করার পর বলেনঃ আমি শুনলাম এবং মান্য করলাম। অতঃপর তিনি তার সহকর্মীদের বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন 'নাখলাহ' অভিমুখে যাত্রা করি এবং সেখানে অবস্থান করে কুরাইশ কাফিলার গতিবিধি লক্ষ্য করে তাঁর কাছে খবর পৌঁছাই। তিনি আরো বলেছেন যে, আমার সাথে যেতে তোমাদের কাউকে যেন জোর-জবরদস্তি না করি। সুতরাং যার শহীদ হওয়ার আকাঙ্খা রয়েছে সে যেন আমার সাথে অগ্রাভিযানে যোগ দেয়, আর যার এরূপ ইচ্ছা নেই সে ফিরে যেতে পারে। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাঃ) এবং তাঁর সহযোদ্ধাগণ পিছন ফিরে না গিয়ে অভিযানে অগ্রসর হোন।

'আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাঃ) তাঁর লোকজনসহ 'ফুরু' নামক স্থানের কাছে হিযাযের, বুহরান নামক স্থানে পৌঁছান। সেখানে সা 'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং 'উতবাহ গাজওয়ান (রাঃ) তাঁদের উটটি

হারিয়ে ফেলেন, যার ওপর তারা পর্যায়ক্রমে আরোহণ করতেন। তাঁরা দু' জন তাঁদের উটটি খুঁজতে থাকেন এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাঃ) তাঁর সাথীদের নিয়ে নাখলাহতে না পৌঁছা পর্যন্ত সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। তাঁরা দেখতে পান যে, কুরাইশদের একটি কাফিলা খাদ্য, কিসমিস ও অন্যান্য বাণিজ্যিক দ্রব্যসহ তাদেরকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। ঐ কাফিলায় 'আমর ইবনু হাযরামী (যার অপর নাম ছিলো 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাদ) , মাখযুম গোত্রের 'উসমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগীরাহ এবং তাঁর ভাই নাওফিল ইবনু 'আবদুল্লাহ এবং হিশাম ইবনু মুগীরার মুক্ত দাস হাকাম ইবনু কাইসানও ছিলো। তারা সাহাবীগণকে দেখতে পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু যখন তাদের দলে উক্কাসাহ ইবনু মিহসানকে দেখতে পেলো তখন কাফিরদের ভয় দূর হয়ে গেলো, যেহেতু তার মাথায় চুল ছিলো মুণ্ডন করা। তারা নিজেরা বলাবলি করছিলোঃ এই লোকেরা 'উমরাহ্ করে এসেছে, অতএব তাদের ব্যাপারে ভয় পাবার কিছুই নেই।

সাহাবীগণ নিজেদের মাঝে আলাপ আলোচনা করলেন। ঐ দিনটি ছিলো রজব মাসের শেষ দিন। তারা বলাবলি করছিলোঃ মহান আল্লাহ্র শপথ! তোমরা যদি তাদেরকে অবসর হওয়ার সুযোগ দাও তাহলে তারা হারাম এলাকায় প্রবেশ করবে এবং তখন তোমাদের কিছুই করার থাকবে না, আর তোমরা যদি তাদেরকে হত্যা করো তাহলে নিষিদ্ধ মাসে তাদেরকে হত্যা করা হবে। প্রথমদিকে তারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং কাফিরদেরকে আক্রমণ করা অপছন্দ করে। অতঃপর তারা নিজেরাই আবার উদ্দীপ্ত হয়ে কাফিরদের যেখানে যাকে পাওয়া যায় তাকে হত্যা করতে এবং মালামাল আটক করতে প্রস্তুত হোন। অতঃপর ওয়াকিদ ইবনু 'আবদুল্লাহ আত তামিমী (রাঃ) কাফিরদের 'আমির ইবনু হাযরামীকে লক্ষ্য করে এমন তীর নিক্ষেপ করেন যে, তাতেই তার মৃত্যুর ফায়সালা হয়ে যায়। 'উসমান ইবনু 'আবদুল্লাহ এবং হাকাম ইবনু কাইসানকে বন্দী করা হয়, আর নাওফাল ইবনু 'আবদুল্লাহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রাঃ) এবং তার সহযোদ্ধাগণ দুই বন্দী এবং তাদের সাথে থাকা মালামালসহ মাদীনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে ফিরে যান। পথেই সেনাপতি বলে দিয়েছিলেন যে, এই মালের এক পঞ্চমাংশ তো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর জন্যই থাকবে। সুতরাং এ অংশটি তাঁরা পৃথক করে রেখে দেন এবং বাকি অংশ সাহাবীগণের মধ্যে বন্টন করে দেন। যুদ্ধলব্ধ মালের এক পঞ্চমাংশ যে বের করে দিতে হবে এই নির্দেশ তখন পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়নি। যখন তাঁরা মহানবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর কাছে উপস্থিত হোন তখন তিনি এই ঘটনা শুনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন, 'নিষিদ্ধ মাসগুলোতে যুদ্ধ করতে আমি তোমাদেরকে কখন বলেছিলাম?' না তিনি সেই যাত্রী দলের কোন মাল গ্রহণ করলেন, আর না বন্দীদেরকে স্বীয় অধিকারে নিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর এই কথায় ও কাজে তাঁরা খুবই লজ্জিত হলেন এবং নিজেদের পাপ কাজ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। অতঃপর অন্যান্য মুসলিমরাও তাদের সমালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। আর ঐ দিকে মুশরিক কুরাইশরা বিদ্রƒপ করতে আরম্ভ করলো যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সহচরগণ নিষিদ্ধ মাসগুলোর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে বিরত থাকেন না। অপর দিকে 'আমর ইবনু হাযরামী নিহত হয়েছিলো বিধায় ইয়াহূদীরা একটি কুলক্ষণ বের করে যে, عُمِرَتِالْحَرْبُ অর্থাৎ 'দীর্ঘদিন ধরে প্রচণ্ড ও ভয়াবহ যুদ্ধ চলতে থাকবে।' 'আমরের পিতার নাম ছিলো হাযরামী। এজন্যই তারা কুলক্ষণ গ্রহণ করে বলে حَضَرَتِالْحَرْبُ অর্থাৎ যুদ্ধের সময় উপস্থিত হয়ে গেছে। হত্যাকারীর নাম ওয়াকিদ (রাঃ) , কাজেই তারা বলে وَقَدَتِالْحَرْبُ অর্থাৎ যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে।' কিন্তু মহান আল্লাহ্ এর বিপরীত করে দেন এবং পরিণাম সবই মুশরিকদের প্রতিকূলে হয়। তাদের প্রতিবাদে উত্তর দিয়ে আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়। এতে বলা হয় যে, যুদ্ধ যদি নিষিদ্ধ মাসে হয়েই থাকে তাহলে তোমাদের কার্যাবলী এর চেয়েও জঘন্য। তোমাদের অশান্তি সৃষ্টি করা হচ্ছে এই যে, তোমরা মুসলিমদেরকে মহান আল্লাহ্র দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সম্ভাব্য কোন

চেষ্টারই ত্রুটি করো নি। এটা হত্যা অপেক্ষাও বেশি মারাত্মক। তোমরা এসব কাজ হতে না বিরত হচ্ছো, না তাওবাহ করছো, আর না লজ্জিত হচ্ছো। এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পর মুসলিমগণ এই দুঃখ হতে মুক্তি প্রাপ্ত হোন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যাত্রীদলকে ও বন্দীদেরকে নিজের অধিকারে নিয়ে নেন। কুরাইশরা রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট দূত পাঠিয়ে বলে, ‘মুক্তিপণ নিয়ে ‘উসমান ইবনু ‘আবদুল্লাহ এবং হাকাম ইবনু কাইসানকে ছেড়ে দিন।’ কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দূতকে বলেন, ‘আমরা দু’ জন সাহাবী সা ‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) এবং ‘উত্বা ইবনু গাজওয়ান (রাঃ) যখন এসে যাবেন তখন তোমরা এসো। আমার ভয় হয় যে, তোমরা তাদেরকে কষ্ট দিবে। অতএব তারা উভয়ে এসে গেলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুক্তি পণের বিনিময়ে বন্দীদ্বয়কে মুক্ত করে দেন। হাকাম ইবনু কাইসান তো মুসলিম হয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর খিদমাতেই রয়ে যান। তিনি ‘বিরএ মা ‘উনা’ যুদ্ধে অংশ নিয়ে শহীদ হোন ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্তর জন সাহাবীকে ইসলাম শিক্ষাদানের উদ্দেশে নাজদ প্রেরণ করেন, কিন্তু বানু সালীমের লোকেরা দুই জন বাদে অন্য সবাইকে হত্যা করে। ‘উসমান ইবনু ‘আবদুল্লাহ মাক্কা ফিরে যায় এবং সেখানে সে কুফরী অবস্থায়ই মারা যায়। এই আয়াত শুনে ঐ বিজেতাগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হোন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সন্তুষ্টি, সাহাবীগণের সমালোচনা ও কাফিরদের বিদ্রƒপের কারণে তাঁদের অন্তরে যে দুঃখ ছিলো, সবই দূর হয়ে যায়। কিন্তু এখন তাদের মনে এই চিন্তা হয় যে, এ যুদ্ধের ফলে তারা পারোলৌকিক সাওয়াব লাভ করবেন কিনা এবং গাজীদের মধ্যে তাদেরকে গণ্য করা হবে কিনা! এ সম্বন্ধে তারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে জিজ্ঞেস করলেঃ

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং হিজরত করেছে ও মহান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করেছে, এরাই মহান আল্লাহ্‌র রহমত আশা করে। মহান আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এর দ্বারা মহান আল্লাহ্‌ তাদেরকে বড় বড় আশা প্রদান করেন। (ইবনু হিশাম ২/২৫২-২৫৫)

এ বিষয়টি একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। নবী ﷺ দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী ‘নাখ্‌লা’ নামক স্থানে আট জনের একটি বাহিনী পাঠান। কুরাইশদের গতিবিধি ও তাদের সংকল্প সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করার দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করেন। যুদ্ধ করার কোন অনুমতি তাদেরকে দেননি। কিন্তু পথে তারা কুরাইশদের একটি ছোট বাণিজ্যিক কাফেলার মুখোমুখি হয়। কাফেলার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তারা একজনকে হত্যা করে এবং বাদবাকি সবাইকে গ্রেফতার করে অর্থ ও পণ্য সম্ভারসহ তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসে। তাদের এ পদক্ষেপটি এমন এক সময় গৃহীত হয় যখন রজব শেষ হয়ে শাবান মাস শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাদের এ আক্রমণটি রজব মাসে (অর্থাৎ হারাম মাসে) সংঘটিত হয়েছিল কি না ব্যাপারটি সম্পর্কে সন্দেহ জাগে। কিন্তু কুরাইশরাও পর্দান্তরালে তাদের সাথে যোগসাজশকারী ইহুদী ও মদীনার মুনাফিকরা মুসলমানদের বিরুদ্দে প্রচারণা চালাবার জন্য এ ঘটনাটির কথা চারদিকে ব্যাপকভাবে ছড়াতে থাকে। তারা কঠিন আপত্তি জানিয়ে অপ্রচার করতে থাকে হ্যাঁ, এরা বড়ই আল্লাওয়ালা হয়েছে। অথচ হারাম মাসেও রক্তপাত করতে কুন্ঠিত হয় না। এ আয়াতে তাদের এ আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। জবাবের সার নির্যাস হচ্ছেঃ হারাম মাসে লড়াই করা নিঃসন্দেহে বড়ই গর্হিত কাজ। কিন্তু এর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করা তাদের জন্য শোভা পায় না, যারা শুধুমাত্র এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার কারণে

তেরো বছর ধরে তাদের অসংখ্য ভাইয়ের ওপর যুলুম নির্যাতন চালিয়ে এসেছে। তাদেরকে এমনভাবে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত করেছে যে, তারা স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। তারপর এখানেই তারা ক্ষান্ত হয়নি। তাদের ঐ ভাইদের মসজিদে হারামে যাবার পথও বন্ধ করে দিয়েছে। অথচ মসজিদে হারাম কারোর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। গত দু' হাজার বছর থেকে কোন দিন কাউকে এ ঘরের যিয়ারতে বাধা দেয়া হয়নি। কাজেই এ ধরনের কলঙ্কিত চরিত্রের অধিকারী জালেমরা কোন্ মুখে সামান্য একটি সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে এত বড় হৈচৈ করে বেড়াচ্ছে এবং আপত্তি ও অভিযোগ উত্থাপন করে চলছে? অথচ এ সংঘর্ষে নবীর অনুমতি ছাড়াই সবকিছু ঘটেছে। এ ঘটনাটিকে বড় জোর এভাবে বলা যেতে পারে, একটি ইসলামী জামায়াতের কয়েকজন লোক একটি দায়িত্বহীন কাজ করে বসেছে।এ প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে, এ তথ্য সংগ্রহাক বাহিনীটি বন্দী ও গনীমাতের মাল নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হবার সাথে সাথেই তিনি বলেন, আমি তো তোমাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেইনি। তাছাড়া তারা যে গনীমাতের মাল এনেছিল তা থেকে তিনি বাইতুল মালের অংশ নিতেও অস্বীকৃতি জানান। তাদের এ লুণ্ঠন অবৈধ ছিল, এটি তারই প্রমাণ। সাধারণ মুসলমানরাও এ পদক্ষেপের কারণে এর সাথে সংশ্লিষ্ট নিজেদের লোকদেরকে কাঠোরভাবে তিরস্কার করে। মদীনার একটি লোকও তাদের এ কাজের প্রশংসা করেনি।

সততা ও সৎপ্রবণতার ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের কোন কোন সরলমনা ব্যক্তি মক্কার কাফের ও ইহুদিদের উপরোল্লিখিত অভিযোগে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। এই আয়াতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের এসব কথায় তোমাদের ও তাদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে যাবে, একথা মনে করো না। তারা বোঝাপড়ার জন্য অভিযোগ করছে না। তারা তো আসলে কাঁদা ছুঁড়তে চায়। তোমরা কেন এই দ্বীনের প্রতি ঈমান এনেছো এবং কেন দুনিয়াবাসীর সামনে এর দাওয়াত পেশ করে চলেছো-একথা তাদের মনে কাঁটার মতো বিঁধছে। কাজেই যতদিন তারা নিজেদের কুফরীর ওপর অটল রয়েছে এবং তোমরাও এই দ্বীন ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছো ততদিন তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন প্রকার বোঝাপড়া ও সমঝোতা হতে পারে না। আর এই ধরনের শত্রুদেরকে তোমরা মামুলি শত্রু মনে করো না। যারা তোমাদের অর্থ-সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে চায় তারা অপেক্ষাকৃত ছোট পর্যায়ের শত্রু। কিন্তু যারা তোমাদেরকে আল্লাহর সত্য দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিতে চাই তারাই তোমাদের নিকৃষ্টতম শত্রু। কারণ প্রথম শত্রুটি তোমাদের বৈষয়িক ক্ষতি করতে চাই কিন্তু দ্বিতীয় শত্রুটি চায় তোমাদেরকে আখেরাতের চিরন্তন আযাবের মধ্যে ঠেলে দিতে এবং এজন্য সে তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২১৮

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

বিপরীত পক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে বাড়ি-ঘর ত্যাগ করেছে ও জিহাদ করেছে তারা সঙ্গতভাবেই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের প্রতি নিজের করুণাধারা বর্ষণ করবেন।

২১৮ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] জিহাদের শাব্দিক অর্থ হলো: চেষ্টা করা, সাধনা করা, তা কাজ অথবা কথা যেকোন মাধ্যমে হতে পারে। শর"য়ী পরিভাষায় - কাফের, সীমালংঘনকারী অথবা মুরতাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের যুদ্ধের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাকে জিহাদ বলে। কুরআন ও হাদীসের সংখ্যা বর্ণনায় জিহাদের অসাধারণ ফয়ীলতের কথা বিধৃত হয়েছে। আল্লাহ্ রাববুল আলামীন জিহাদকে একটি লাভজনক ব্যবসা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন, তাদের জন্য জান্নাত আছে এর বিনিময়ে। তারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করে, মারে ও মরে। তাওরাত, ইন্জীল ও কুরআনে এ সম্পর্কে তাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ্র চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করেছ সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং ওটাই তো মহাসাফল্য" [সূরা আত-তাওবাঃ ১১১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদকে ইসলামের সর্বোচ্চ শিখর হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেনঃ 'সকল কিছুর মূল হলো ইসলাম। যার খুঁটি হলো সালাত এবং সর্বোচ্চ শিখর জিহাদ' । [তিরমিযী ২৬১৬]

জিহাদের তুলনা অন্য কিছু দ্বারা হয় না। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা জিহাদের পরিপূরক হতে পারে' । রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেনঃ 'আমি পাইনি'। [বুখারীঃ ২৮১৮]

এছাড়া আল্লাহ্র পথে যারা জিহাদ করবে, তাদেরও অসংখ্য মর্যাদার কথা ঘোষিত রয়েছে কুরআন ও হাদীসে। যেমন, আল্লাহ্ রাববুল আলামীন বলেনঃ "আর আল্লাহ্র পথে যারা নিহত হয় তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না" । [সূরা আল-বাকারাহঃ ১৫৪]

অপর হাদীসে এসেছে, জিহাদের ময়দানে শাহাদাতবরণকারীরা আল্লাহ্ রাববুল আলামীন-এর সম্মানীত মেহমান। মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, 'শহীদদের ছয়টি মর্যাদা রয়েছে – (১) রক্তের প্রথম ফোটা মাটিতে পড়ার সাথে সাথেই তাকে মাফ করে দেয়া হয়। (২) জান্নাতে তার অবস্থানস্থল দেখিয়ে দেয়া হয়। (৩) কবরের আযাব থেকে মুক্ত থাকবে এবং মহা শংকার দিনে শংকামুক্ত থাকবে। (৪) তাকে ঈমানের অলংকার পরানো হবে। (৫) জান্নাতের হুর তাকে বিয়ে করানো হবে। (৬) তার নিকটাত্মীয়দের থেকে সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করার সুযোগ দেয়া হবে। [বুখারীঃ ২৭৯০]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলিমের উপর সব সময়ই জিহাদ ফরয। তবে কুরআনের কোন কোন আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ''আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের বর্ণনাতে বোঝা যায় যে, জিহাদের এ ফরয, ফরযে-"আইনরূপে প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয সাব্যস্ত হয় না, বরং এটা ফরযে কেফায়া। যদি মুসলিমদের কোন দল তা আদায় করে, তবে সমস্ত মুসলিমই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জিহাদের ফরয আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলিমই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমাকে প্রেরণের পর থেকে কেয়ামত পর্যন্ত জিহাদ চলতে থাকবে, আমার উম্মতের সর্বশেষ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে' । [আবু দাউদঃ ২৫৩২]

কুরআনের অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ "আল্লাহ্ তা'আলা জান ও মালের দ্বারা জিহাদকারীগণকে জিহাদ বর্জনকারীদের উপর মর্যাদা দিয়েছেন এবং উভয়কে পুরস্কার দেয়ার কথা ঘোষণা করেছেন" । [সূরা আন-নিসাঃ ৯৫]

সুতরাং যেসব ব্যক্তি কোন অসুবিধার জন্যে বা অন্য কোন দ্বীনী খেদমতে নিয়োজিত থাকার কারণে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারে নি, তাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পুরস্কার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, জিহাদ যদি ফরযে-আইন হতো, তবে তা বর্জনকারীদের সুফল দানের কথা বলা হত না। তাছাড়া হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার পিতা-মাতা কি বেঁচে আছেন? উত্তরে সে বলল, জি, বেঁচে আছেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উপদেশ দিলেনঃ 'তুমি পিতা-মাতার খেদমত করেই জিহাদের সওয়াব হাসিল কর' । [মুসলিমঃ ২৫৪৯]

এতেও বোঝা যায় যে, জিহাদ ফরযে-কেফায়া। যখন মুসলিমদের একটি দল ফরয আদায় করে, তখন অন্যান্য মুসলিম অন্য খেদমতে নিয়োজিত হতে পারে। তবে যদি মুসলিমদের নেতা প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার আহবান করেন, তখন জিহাদ ফরযে-আইনে পরিণত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমের এরশাদ হয়েছেঃ "হে মুমিনগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে যাও, তখনই তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে যমীনে ঝুঁকে পড়" । [সূরা আত-তাওবাঃ ৩৮]

এ আয়াতে আল্লাহ্র পথে বেরিয়ে পড়ার সার্বজনীন নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ্ না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ অমুসলিম দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পাশ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরও সে ফরয আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবতী মুসলিম দেশের উপর, এমনি সারা বিশ্বের প্রতিটি মুসলিমের উপর এ ফরয পরিব্যপ্ত হয় এবং ফরযে-আইন হয়ে যায়। কুরআনের আলোচ্য আয়াতসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদিসগণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, জিহাদ স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে ফরযে-কেফায়া। আর যতক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ ফরযে-কেফায়া পর্যায়ে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তানদের পক্ষে পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে অংশ গ্রহণ করা জায়েয নয়। কিংবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ

করার পূর্ব পর্যন্ত এ ফরযে কেফায়াতে অংশ গ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যখন এ জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে-আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী বা স্ত্রী ঋণদাতা কারোরই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

জিহাদ অর্থ হচ্ছে, কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে নিজের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এটি নিছক যুদ্ধের সমার্থক কোন শব্দ নয়। যুদ্ধের জন্য আরবীতে 'কিতাল' (রক্তপাত) শব্দ ব্যবহার করা হয়। জিহাদের অর্থ তার চাইতে ব্যাপক। সব রকমের প্রচেষ্টা ও সাধনা এর অন্তর্ভুক্ত। মুজাহিদ এমন এক ব্যক্তিকে বলা হয়, যে সর্বক্ষণ নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাধনে নিমগ্ন, যার মস্তিষ্ক সবসময় ঐ উদ্দেশ্য সম্পাদনের উপায় ও কৌশল উদ্ভাবনে ব্যস্ত। যার কণ্ঠ ও লেখনি নিজের উদ্দেশ্যের প্রচারণায় নিয়োজিত। মুজাহিদের হাত, পা ও শরীরের প্রতিটি অংগ প্রত্যংগ জিহাদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য সারাক্ষন প্রচেষ্টা, সাধনা ও পরিশ্রম করে চলছে। জিহাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সে নিজের সম্ভাব্য সমস্ত উপায়-উপকরণ নিয়োগ করে, পূর্ণ শক্তি দিয়ে এই পথের সমস্ত বাঁধার মোকাবিলা করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন প্রাণ উৎসর্গ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তখন নির্দ্বিধায় এগিয়ে যায়। এর নাম 'জিহাদ।' আর আল্লাহর পথে জিহাদ হচ্ছেঃ এ সবকিছু একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে। এই দুনিয়ায় একমাত্র আল্লাহর দ্বীন তথা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আল্লাহর বাণী ও বিধান দুনিয়ার সমস্ত মতবাদ, চিন্তা ও বিধানের ওপর বিজয় লাভ করবে। মুজাহিদের সামনে এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকবে না।

তারপর আল্লাহ তা 'আলা বলেন, তারা যখন নিজেদের অপকর্ম, চক্রান্ত এবং তোমাদের মুরতাদ করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকল না তাহলে হারাম মাসের কারণে তাদের মোকাবেলা করা থেকে তোমরাও বিরত থেকো না?

(وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ)

'যে ব্যক্তি দীন ইসলাম থেকে ফিরে যাবে' অর্থাৎ মুরতাদ হয়ে যাবে তাওবা না করলে তার পার্থিব শাস্তি হল হত্যা বা মৃত্যুদণ্ড।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি তার দীনকে পরিবর্তন করে তাকে হত্যা কর। (সহীহ বুখারী হা: ৩০১৭) আর এ আয়াতে পরলৌকিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

এ থেকে বুঝা যায় সারা জীবন সৎ আমল করে অবশেষে মুরতাদ হয়ে গেলে তার সব সৎ আমাল বরবাদ হয়ে যায়। যেমন ঈমান আনার পর পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়।

মুরতাদ যদি তাওবা করে তাহলে তাকে হত্যা করা যাবে না এবং শর্ত অনুযায়ী তাওবাহ করলে আল্লাহ তা ‘আলা তা কবূল করেন। তারপর আল্লাহ তা ‘আলা তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত ব্যক্তিদের কথা বলছেন-

১. যারা ঈমান আনে,

২. যারা হিজরত করে,

৩. যারা আল্লাহ তা ‘আলার রাস্তায় জিহাদ করে। প্রকৃতপক্ষে তারাই আল্লাহ তা ‘আলার রহমাতের আশাবাদী।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. হারাম মাস ও হারাম শহরের মর্যাদা জানতে পারলাম।

২. হারাম মাসে যুদ্ধ-জিহাদের নিষেধাজ্ঞা রহিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাওয়াজেন ও সাকিফ গোত্রের বিরুদ্ধে শাওয়াল ও যুলকাদা মাসে যুদ্ধ করেছেন।

৩. কাফিররা মুসিলমদের মুরতাদ না বানানো পর্যন্ত যুদ্ধের অপচেষ্টা চালাতে থাকবে।

৪. ঈমান, হিজরত ও জিহাদের ফযীলত জানতে পারলাম।